Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশের প্রতিটি সমাজে নাস্তিব্যবাদের বিস্তার রোধে আমাদের করনীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ শাবনুর আক্তার শোভা

রোলঃ 228020338

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশের প্রতিটি সমাজে নাস্তিব্যবাদের বিস্তার রোধে আমাদের করনীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ শাবনুর আক্তার শোভা

রোলঃ 228020338

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বাংলাদেশের প্রতিটি সমাজে নাস্তিব্যবাদের বিস্তার রোধে আমাদের করনীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছাঃ শাবনুর আক্তার শোভা, আইডিঃ 228020338 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বাংলাদেশের প্রতিটি সমাজে নাস্তিব্যবাদের বিস্তার রোধে আমাদের করনীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

শোভা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

মোছাঃ শাবনুর আক্তার শোভা

আইডিঃ 228020338

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা : 5

নাস্তিক্যবাদের সংঙ্গা :...5

নাস্তিক কাকে বলে?..7

একজন ব্যক্তি কিভাবে নাস্তিক সাব্যস্ত হয় ?...9

ইসলাম প্রাক-পরবর্তী যুগে নাস্তিকতা :...9

বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদী তৎপরতার গোড়ার কথা :..10

নাস্তিক্যবাদের কারণ: 11

নাস্তিক্যবাদের বিস্তারের প্রভাব...18

নাস্তিক্যবাদ প্রতিরোধে করনীয় 26

গনহারে ইসলামের দাওয়াত 26

দ্বীনি জ্ঞানার্জন: 27

উলামায়ে কেরামের ভুমিকা :..27

পশ্চিমাদের অসড়তা তুলে ধরা :..28

বিজ্ঞানকে কোরআন দিয়ে পর্যালোচনা:..28

আমলের প্রতি গুরুত্বারোপ 29

সামাজিক পর্যায়ে ক্যাম্পেইন : 29

উপসংহার:...30

রেফারেন্স : 30

ভুমিকা :

সমস্ত প্রসংশা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার যিনি সৃষ্টির সেরা মাখলুক হিসেবে আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এবং খাদ্য,পানীয়, আলো,বাতাস সহ অফুরন্ত নিয়ামতে আমাদেরকে পরিপূর্ন করে রেখেছেন। বিনিময়ে তিনি আমাদের কাছে চেয়েছেন শুধু তার ইবাদত এবং কৃতজ্ঞতা। অথচ আমরা মানুষেরা তার সমস্ত নেয়ামত ভুলে যায় । তার ইবাদত এবং কৃতজ্ঞতা তো দুরের কথা , তার অস্তিত্বকেও অস্বীকার করে বসি। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে এর চেয়ে নিকৃষ্টতম কোনো কাজ আর হতে পারেনা।

আজ গোটা পৃথিবী নানা সমস্যায় জর্জরিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জয়জয়কার অবস্থা আর নানা আবিষ্কারের নেশায় একসময় সমগ্র মানবতা কল্পনা করেছিল যে, এবার বুঝি গোটা পৃথিবী সুখের আকাশে ডানা মেলে উড়বে। কিন্তু তা আর হয়ে উঠেনি। বিশ্ব যতই বস্তুগত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে, ততই সংকট আর মুসীবতের গভীর থেকে গভীরে তলিয়ে গেছে। আজ আমাদের জীবনে সম্পদের প্রাচুর্য্য এসেছে, পার্থিব বিলাস-ব্যসনের সকল উপকরণ বিদ্যমান আছে। কিন্তু নেই সুখ ও শান্তির নামের সেই সোনার হরিণ। বরং প্রতিনিয়ত এসব সমস্যা ও সংকটের পরিমাণ বেড়েই চলছে। মানসিক চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা চারপাশ থেকে আমাদের ঘিরে ধরেছে। ফিতনা ও ফাসাদ আমাদের ওপর রাজত্ব কায়েম করে আছে। স্বার্থপরতা আর চরিত্রহীনতার সর্বত্র জয়জয়কার অবস্থা। জুলুম আর নির্যাতন নিজের সকল রূপ নিয়ে নৃত্য করছে। প্রতি মুহূর্তেই কেউ কেউ না রাজনীতির বলির পাঠা হচ্ছে। ধন-সম্পদের কারণে প্রতিদিনই মরতে হচ্ছে কাউকে না কাউকে। দু'একটি ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে গোটা পৃথিবীটাই আজ এসব সমস্যার সম্মুখীন। আফসোসের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, মানবতার পার্থিব ও বস্তুগত উন্নতি এসব সমস্যাকে আদৌ কমাতে পারেনি; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মানুষ যতটাই বস্তুগত উন্নতি লাভ করেছে, এসব সমস্যার প্রকোপ ততটাই বেড়েছে।

আর এসব সমস্যা ও সংকটের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হলো নাস্তিক্যবাদ।

নাস্তিক্যবাদের সংঙ্গা :

নাস্তিক্যবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Atheism এবং আরবি প্রতিশব্দ হলো ইলহাদ । স্রষ্টায় বিশ্বাস করা, না করার ওপরে দুই ধরনের মতবাদ রয়েছে। যথা: আস্তিক্যক্যবাদ এবং নাস্তিক্যবাদ । নাস্তিক্যবাদ হলো একটি দর্শন বা মতবাদ যাতে ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে সম্পূর্নরুপে অস্বীকার করা হয়। মূলত আল্লাহর অস্তিত্বকে বর্জনকেই নাস্তিক্যবাদ বলা যায় ।

উইকিপিডিয়াতে নাস্তিক্যবাদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

“নাস্তিক্যবাদ (ইংরেজি ভাষায়: Atheism; অন্যান্য নাম: নিরীশ্বরবাদ, নাস্তিকতাবাদ) একটি দর্শনের নাম যাতে ঈশ্বর বা স্রষ্টার
অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়না এবং সম্পূর্ণ ভৌত এবং প্রাকৃতিক
উপায়ে প্রকৃতির ব্যাখ্যা দেয়া হয়। আস্তিক্যবাদ এর বর্জন কেই নাস্তিক্যবাদ বলা যায়। নাস্তিক্যবাদ বিশ্বাস নয় বরং অবিশ্বাস এবং যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাসকে খণ্ডন নয় বরং বিশ্বাসের অনুপস্থিতিই এখানে মুখ্য।“

নাস্তিক্যবাদ মূলত জগতের সকল দীন ও ধর্মকে অস্বীকারের নাম। এটা আল্লাহর অস্তিত্বে স্বীকার করে না। পরকাল, জান্নাত কিংবা জাহান্নাম কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করে না। এর মতে, এই পৃথিবী আর এখানকার পার্থিব জীবনই সবকিছু। এটাই শুরু আবার এটাই শেষ। নাস্তিক্যবাদ মূলত আজ গোটা পৃথিবীর একটি পরিচিত মুখ। নাস্তিক্যবাদ কখন যে ধীরে ধীরে ইউরোপ ও আমেরিকার সাংবিধানিক ধর্মে পরিণত হয়ে গেছে তা কেউ জানতেও পারেনি। আর সেকারণেই তারা সেই নাস্তিক্যবাদকে কখনো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আবার কখনো ধর্মহীনতা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে।

পশ্চিমের দেশগুলোতে নাস্তিকদের সাধারণ ভাবে ধর্মহীন বা পরলৌকিক বিষয় সমূহে অবিশ্বাসী হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের মত যেসব ধর্মে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয় না, সেসব ধর্মালম্বীদেরকেও নাস্তিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।কিছু নাস্তিক ব্যক্তিগত ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা , হিন্দু ধর্মের দর্শন, যুক্তিবাদ , মানবতাবাদ এবং প্রকৃতিবাদে বিশ্বাস করে। নাস্তিকরা কোন বিশেষ মতাদর্শের অনুসারী নয় এবং তারা সকলে বিশেষ কোন আচার অনুষ্ঠানও পালন করে না। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে যে কেউ, যে কোন মতাদর্শে সমর্থক হতে পারে,নাস্তিকদের মিল শুধুমাত্র এক জায়গাতেই, আর তা হল ঈশ্বরের অস্তিত্ব কে অবিশ্বাস করা।'(বাংলা উইকিপিডিয়া)

প্রাচ্য দুনিয়ার সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র রাশিয়া হলো নাস্তিক্যবাদের লীলাভূমি। কম্যুনিজমের প্রাদুর্ভাবের সেই গোড়া থেকেই রাশিয়া একে বুকে আগলে রেখেছে। সকল সংকট আর প্রতিকূলতা থেকে একে রক্ষা করেছে। কম্যুনিজম ‘গায়েব’ বা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে না। এর মতে, পৃথিবীর এই জীবনই সবকিছু। পৃথিবীতে মানুষ যে লড়াই আর সংগ্রাম করে, তাও মূলত এখানে টিকে থাকারই সংগ্রাম। রাশিয়া ব্যতীত প্রাচ্যের অধিকাংশ দেশই এতদিন পর্যন্ত হিন্দু, বৌদ্ধ কিংবা কনফুসিয়াস ইত্যাদি ধর্ম-বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পশ্চিমা নাস্তিক্যবাদের বাধভাঙা জোয়ারের সামনে শেষ পর্যন্ত সেগুলো দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। ভেসে গেছে প্রচণ্ড স্রোতের তোড়ে।ঃ
গোটা পৃথিবীর এমন সঙ্গিন ও ঝঞ্ঝাঘন অন্ধকার মুহূর্তে আজও ইসলামী বিশ্ব তাওহীদ আর অদৃশ্যে বিশ্বাসের দীপশিখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এর চারপাশে নৃত্য করছে প্রচণ্ড তুফান-

ব্যাত্যা। যেন হঠাৎ এসে এক ঝটকায় নিবিয়ে দিবে এই সর্বশেষ প্রদীপটির আলোটুকুও। তাই আমাদেরকে এখনই সতর্ক হতে হবে। এখনই নেমে পড়তে হবে কোমর বেঁধে।

নাস্তিক কাকে বলে?

স্রষ্টাকে বিশ্বাস করা না করার ওপর ভিত্তি করে যেমন দুই ধরনের মতবাদ রয়েছে তেমনি এই মতবাদের ওপর ভিত্তি করে দুই শ্রেনির মানুষ রয়েছে। যথা : আস্তিক এবং নাস্তিক।যারা নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী ‘অর্থাৎ স্রষ্টায় বিশ্বাসী না ,তাদেরকে নাস্তিক বলা হয়। নাস্তিকের ইংংরেজি প্রতিশব্দ Atheist এবং আরবি প্রতিশব্দ হলো মুলহিদ ‘অর্থাৎ যারা ইলহাদের অনুসারী তাদেরকে মুলহিদ বলা হয়।

নাস্তিকেরা যে ধর্মের অনুসারী হোক না কেন, তারা স্রষ্টার অস্তিত্ব, পরকাল ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে না অর্থ্যাৎ যে বিষয়গুলো দেখা যায়না ,ভৌত ও প্রাকৃতিক উপায়ে যেগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না, তারা সেগুলোকে অস্বীকার করে। যেহেতু স্রষ্টা, পরকাল ইত্যাদি বিষয়গুলো দেখা যায়না তাই তারা এগুলোকে অস্বীকার করে। যে জিনিসগুলো তারা সচক্ষে দেখতে পারে, তারা শুধু ওই বিষয়গুলোতেই বিশ্বাস স্থাপন করে । তারা বস্তুবাদে (Materialism) বিশ্বাসী অর্থ্যাৎ যে বিষয়গুলোর physical existence
বা শারীরিক উপস্থিতি বিদ্যমান তারা সেগুলোকে বিশ্বাস করে। আর যে বিষয়গুলো ভাববাদ (Idealism বা conceptual) অর্থাৎ যাদের physical existence নেই ,শুধু ধারনার ওপর নির্ভরশীল, তারা এই বিষয়গুলোকে বিশ্বাস করেনা। স্রষ্টার যেহেতু Physical Existence নেই তাই তারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকেও সম্পূর্নরুপে অস্বীকার করে।
সুরা আ'রাফে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
অর্থঃ- আর আল্লাহর জন্যে রয়েছে উত্তম নাম । কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক । আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা(ইলহাদ) পথে চলে । তারা নিজের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে ।
উল্লিখিত আয়াতে ইয়ুলহিদুন এর অর্থ বাকা পথ।

ইলহাদ শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর রাহ. বলেছেন,
ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, ইলহাদ হচ্ছে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। আরবদের ভাষায় ইলহাদের মুল অর্থ হচ্ছে সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া । (তাফসীরে ইবনে কাসীর) ইমাম বায়জাবি

রাহ. বলেছেন, ভ্রষ্ট তারা, যারা আল্লাহ তা'আলার নাম সম্পর্কে যা প্রমাণিত নয় তা বলে । (তাফসীরে বায়জাবি)ইমাম কুরতুবি রাহ. ও ইমাম শাওকানি রাহ. বলেন,আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে ইলহাদ হচ্ছে তিন ধরনের, ১- আল্লাহ তা'আলার নাম বিকৃত করে, ২- নিজের পক্ষ মনগড়া কিছু বাড়িয়ে, ৩- নিজের মনমতো কিছু কমিয়ে দেওয়া ।(তাফসীরে কুরতুবি, তাফসীরে ফাতহুল কাদীর)আল্লামা সাবুনি দা. বা. বলেন, ইলহাদ হচ্ছে দ্বীনি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়া । (সফওয়াতুত্তাফাসীর)

উপরের ব্যাখ্যাগুলো থেকে একথা বুঝা যায় যে, ইলহাদ বা নাস্তিব্যবাদ হচ্ছে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে নিজের মনমতো কিছু বলা। কুরআনে যেভাবে ইয়াহুদি-মুশরিক-খৃষ্টান-মুনাফিকদের অসারতা বলা হয়েছে সেভাবে মুলহিদ(নাস্তিক) সম্পর্ক আল্লাহ তাআলা বর্ননা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা সুরা জাছিয়াহের ২৪ নম্বর আয়াতে বলেছেন,

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

অর্থঃ তারা বলে, আমাদের পার্থিবজীবনই তো শেষ; আমরা মরি আর বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে । তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই । তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে ।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমামুল মুফাসসিরীন ইবনে কাসীর রাহ. বলেন,এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের মধ্য থেকে নাস্তিকদের এবং তাদের সমমনা আরবের পরকাল অস্বীকারকারী মুশরিকদের ব্যাপারে বলছেন । "তারা বলে, আমাদের পার্থিবজীবনই তো শেষ; আমরা মরি আর বাঁচি " অর্থাত, এখানে কিছু নয় একমাত্র বাসস্থান ছাড়া, একদল মরে আর অন্যদল বাচে, কেয়ামত নেই পরকাল নেই, এটা আরবের পরকাল অস্বীকারকারী মুশরিকরা বলত । ফলসফিরা বলেন, নাস্তিক হচ্ছে, যারা পৃথিবীর শুরু-শেষ অস্বীকার করে, যারা স্রষ্টাকে অস্বীকার করে...! (তাফসীরে ইবনে কাসীর)ইবনে কাসীর রাহ. এর ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় , যে নবীজীর যুগেও কিছু নাস্তিক ও প্রকৃতিবাদী ছিলো যারা আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাস করতেন না।

একজন ব্যক্তি কিভাবে নাস্তিক সাব্যস্ত হয় ?

ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা বিশ্বাস করেন যে একজন স্রষ্টা আছেন যিনি শূন্য থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত সৃষ্টির ওপরে তার রয়েছে নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব।কিন্তু সমস্ত নাস্তিক এই ধরনের বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করেন। তারা স্রষ্টার অস্তিত্ব সহ তার যাবতীয় গুনাবলি ,হুকুম আহকাম ,আদেশ নিশেধ সবকিছুতেই অবিশ্বাসের জাল বিছিয়ে দেন। তারা বিভিন্ন যুক্তি কিংবা অযৌক্তিক কথাবার্তার মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। সমগ্র সৃষ্টির পেছনে যে একজনের সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে কিংবা তার বিশেষ উদ্দেশ্যে রয়েছে তারা এগুলো কিছুতেই মানতে চাননা । যে বিষয়গুলোতে লিপ্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তির নাস্তিক সাব্যস্ত হয়-তা কয়েক প্রকার হতে পারে।একজন ব্যক্তি তার কথা, কাজ কিংবা ইসলাম ত্যাগ করার মাধ্যমে নাস্তিক সাব্যস্ত হতে পারে। যেমন,

১. বিশ্বাসগতভাবে ইসলাম ত্যাগ করা। যেমন- আল্লাহর সাথে শিরক তথা অংশীদার স্থাপন করা, অথবা আল্লাহকে অস্বীকার করা অথবা আল্লাহ তাআলার সাব্যস্ত কোন গুণকে অস্বীকার করা।

২. কোন কথা উচ্চারণ করার মাধ্যমে ইসলাম ত্যাগ। যেমন- আল্লাহ তাআলাকে গালি দেয়া অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয়া।

৩. কর্মের মাধ্যমে ধর্মত্যাগ। যেমন-কোন নোংরা স্থানে কুরআন শরিফ নিক্ষেপ করা। এ কাজ আল্লাহর বাণীকে অবমূল্যায়নের নামান্তর। তাই এটি অন্তরে বিশ্বাস না থাকার আলামত। অনুরূপভাবে কোন প্রতিমাকে অথবা সূর্যকে অথবা চন্দ্রকে সিজদা করা।

৪. কোন কর্ম বর্জন করার মাধ্যমে ইসলাম ত্যাগ। যেমন- ইসলামের সকল অনুশাসনকে বর্জন করা এবং এর উপর আমল করা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নেয়া।

ইসলাম প্রাক-পরবর্তী যুগে নাস্তিকতা :

নাস্তিক্যবাদের ইতিহাস উল্লেখ করা হলে সক্রেটিস, প্লোটো, এরিস্টেটলের নাম সর্বাগ্রে আসে । উইকিপিডিয়া ইংরেজিতে তাদেরকে প্রাচীন নাস্তিক বা ক্লাসিক্যাল নাস্তিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে । অর্থাত, জ্ঞান-বিজ্ঞান যখন ছিল গ্রীকদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো, আর বিশ্ব পরাশক্তি ছিল গ্রীকরা, তখন নাস্তিক্যবাদের দর্শন বিস্তার লাভ করে । কিন্তু যখন রোম-পারস্য বিশ্বের পরাশক্তিরূপে আবির্ভুত হয়, তখন তারা এই নাস্তিক্যবাদের বইগুলিকে জ্বালিয়ে দেয়, অনেক বই বিভিন্ন ঘরে একত্রিত করে তালা মেরে দেয়।ইসলামের যখন আবির্ভাব তখন রোম-পারস্য ছিল বিশ্বের পরাশক্তি । কারণ রোমানরা ছিলো খৃষ্টান, আর পারসিকরা ছিলো অগ্নিপূজারি ।

তাই নাস্তিক্যবাদের কোনো প্রভাব তখন ছিলো না । একেবারে ছিলো না তা নয় বরং কিছু ছিল । যার কারণে তাদের অসারতা উল্লেখ করে কুরআনে করীমের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। খেলাফতে রাশেদা-উমাইয়্যাদের পর আব্বাসিরা যখন খেলাফতের দায়িত্ব নেন তখন অনেক জ্ঞানান্বেষী খলীফাদের আমলে গ্রীসের সেই তালাবদ্ধ পুস্তকাদি মুক্ত করে আরবিতে অনুবাদ করা হয় । তখন অনেক যুক্তিনির্ভর ভ্রান্তদলের জন্ম হয়, যার মধ্যে মুতাযিলা অন্যতম । আবার এমন দলেও জন্ম হয় যাদের ঈমান নিয়ে সংশয় দেখা দেয়, তাদের কেউ কেউ তো এতই বস্তুবাদী ছিলেন যে, তাদের ঈমান নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠে, তাদেরকে বলা হত যিন্দীক । যারা দ্বীনের কিছু মানত, কিছু মানত না। এই যিন্দীক হওয়ার অপরাধে তখন যুক্তিবাদী পন্ডিতদেরকে হত্যা করেন তখনকার খলীফারা, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন আরবি অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রাণভোমরা আব্দুল্লাহ বিন মুকাফফা' ।

আধুনিকযুগে ১৮ শ শতাব্দিতে যখন বিভিন্ন মুসলিম ভু-খন্ড ইউরোপীয়দের কলোনীতে রূপান্তরিত হয় । আর দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের চরম অভাব বিস্তার লাভ করে, তখন অনেক মুসলিম ঘরের সন্তানরা ইউরোপীয় শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে প্রকৃতিবাদী বা অর্ধেক নাস্তিক হয়ে যায় ।

বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদী তৎপরতার গোড়ার কথা :

ধর্মপ্রাণ বাংলাদেশে নাস্তিকের সংখ্যা বরাবরই কম ছিল। এরা সংখ্যায় কম হলেও এদের প্রচার ও বুদ্ধিবৃত্তির বলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিপরীতে অবস্থান নেবার দুঃসাহস দেখাতে পারছে। মূলত গেল শতাব্দীর শুরুভাগে রাশিয়ার কমিউনিজমে বিশ্বাসীরা এ দেশে নাস্তিকতার প্রসার ঘটিয়েছে। সারাবিশ্বে সমাজতন্ত্রের জয়জয়কারের সঙ্গে হাত ধরে সেক্যুলারিজম আর সেক্যুলারিজমের গর্ভ থেকেই নাস্তিক্যবাদ বা এইথিজমের উদ্ভব ও আগমন। সমাজতন্ত্রের যৌবনে এরা প্রধানত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তাদের মতবাদ প্রচার করতে শুরু করে।

সমস্যা জর্জরিত সদ্য স্বাধীন অভাবী বাংলাদেশে এরা সহজেই তাদের সাম্যের মুখরোচক শ্লোগানে তরুণ সমাজকে মুগ্ধ করে।

স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদের প্রকাশ্য রূপ দেখা দেয়। ১৯৭৩ সালে তরুণ কবি দাউদ হায়দার একটি কবিতায় অত্যন্ত নোংরা ভাষায় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও যিশুখ্রিস্ট নিয়ে ন্যাক্কারজনক কবিতা লেখেন।

বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদকে প্রকাশ্যে বলে বেড়াবার বিষয় হিসেবে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন চট্টগ্রামের প্রয়াত জ্ঞানপাপী ড. আহমদ শরীফ। সারা জীবন তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করেন।

নাস্তিক্যবাদের কারণ:

আজ থেকে মাত্র দুই শ’ বছর আগেও পৃথিবীতে নাস্তিক্যবাদের এতটা ছড়াছড়ি আর বাহাদুরী ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে গত দুইটি শতাব্দী জুড়ে একের পর এক এমন অনেক উপাদান তৈরি হয় যা শেষমেশ এই নাস্তিক্যবাদকে একটি বিস্তৃত ধর্মে পরিণত করে। আব্দুর রহমান এবং আব্দুল খালেক তাদের সম্মিলিত গবেষনায় নাস্তিক্যবাদের সাতটি প্রধান কারন তুলে ধরেছেন। নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হলো :

এক. ইউরোপীয় গির্জা:আজ গোটা পৃথিবীতে ধর্মহীনতা, অবিশ্বাস ও নাস্তিক্যবাদের বিস্তারের জন্য সর্বপ্রথম যাকে দায়ী করা যায় তা হলো ইউরোপীয় খ্রিস্টান গির্জা। ইতিহাসে দেখা যায়, একসময় গোটা ইউরোপ জুড়ে ছিল গির্জার শাসন। পাদরি আর পুরোহিতরাই ছিলেন রাষ্ট্রের অন্যতম সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ। আর এই সুযোগে তারা তখন নিজেদের ইচ্ছেমতো খ্রিস্টধর্মে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন অসংখ্য মিথ্যা, ভোজবাজি আর কুসংস্কার। নিজেদের মন-মগজে আসা অর্থহীন চিন্তা-ভাবনাকে আসমানী পয়গাম বলে চালিয়ে দিতে তাদের বিবেকে বাধতো না। ঈসা আলাইহিস সালাম-কে মানুষ থেকে মা‘বুদের স্তরে পৌঁছে দেওয়া, শূলে প্রাণ বিসর্জন আর গোটা মানবতার ‘পাপমুক্তি’ ইত্যাদির মতো মস্তিষ্কের অসার কল্পনাগুলোকে তারা ধর্মের মূলনীতিতে রূপ দিয়েছিল। ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি এই বিশ্ব, পৃথিবী ও জীবন সম্পর্কেও তারা বিভিন্ন অলীক ধারণা পোষণ করত ও মানুষকে তা জানাত। কিন্তু পরবর্তীতে যখন ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাগরণ আসে তখন ইউরোপের মাটিতে জন্ম নিতে থাকেন অসংখ্য বিজ্ঞানীগণ। তারা পৃথিবীর রহস্য ও বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ প্রকৃত তথ্য মানুষকে জানাতে শুরু করেন, ঠিক তখনোই গির্জার ন্তঅন্তরালে লুকায়িত খ্রিস্টধর্মের ধ্বজাধারীরা আদাজল খেয়ে তাদের বিরুদ্ধে ময়দানে নামে। গির্জার পুরনো মতামতকে বাদ দিয়ে যারা নতুন নতুন আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক ধারণাকে সত্যায়ন করেছিল তাদেরকে অবিশ্বাসী, ধর্মদ্রোহী আর স্তিনাস্তিক বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। শাসকগোষ্ঠীকে সেসব তথাকথিত ধর্মদ্রোহীকে ধরে ধরে হত্যা ও আগুনে পোড়াতে সুপারিশ করে। এভাবেই কেবল গির্জার মতামতের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে সেসময় অগণিত-অসংখ্য প্রতিভাধর বিজ্ঞানীকে হারায় ইউরোপের মাটি ও মানুষ।কিন্তু বিজ্ঞানের এই নব-জাগরণের প্রবল স্রোত বালুর বাধ দিয়ে গির্জা তাকে আটকে রাখতে পারেনি। বিজ্ঞানীগণ প্রতিনিয়ত নতুন নতুন তথ্য ও আবিষ্কার মানুষের সামনে পেশ করতে থাকেন আর গির্জার পুরোহিতরা একের পর এক হোঁচট খেতে থাকেন। এভাবে এক পর্যায়ে এসে গির্জার গোমর মানুষের সামনে ফাঁস হয়ে পড়ে। ইউরোপের মাটিতে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীগণ উঠে আসেন নেতৃত্বের আসনে। মানুষের মাঝে এক নবতর জাগরণ নামে। তারা সকলে মিলে একযোগে হামলে পড়ে গির্জা ও গির্জার অধিবাসীদের ওপর। আবিষ্কার করে গির্জার দেওয়ালের ভেতরের এক লজ্জাকর দুনিয়া। যেখানে ভালো মানুষের পোশাকের ভেতরে লুকায়িত ছিল পাশবিক চরিত্রের পুরোহিত নামধারী কতগুলো মানুষ। তাদের অশ্লীলতা আর দুশ্চরিত্র দেখে সাধারণ

মানুষ ভিরমি খাওয়ার উপক্রম হয়। সিদ্ধান্ত হয়- না এই গির্জার অধীনে আর থাকা যাবে না। এসব লোকদের নেতৃত্ব থেকে আমাদের অবশ্যই আযাদ হতে হবে। আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কর আর চাঁদাবাজিরও অবসান ঘটাতে হবে। এভাবেই ইউরোপের মানুষগুলো এক ধর্মের দোষ সব ধর্মের ওপর চাপিয়ে দেয়। একটি বিশেষ ধর্মকে

ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে সব ধর্মকেই ছুঁড়ে ফেলে। সকল নবী ও রাসূলই তাদের চক্ষুশূলে পরিণত হন। যেকোনো অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি আহ্বানকেই তারা মস্তিষ্কের ঊষর কল্পনা আখ্যায়িত করে নিক্ষেপ করে আস্তকুঁড়ে। ধর্ম পরিণত হয় তাদের প্রধান দুশমনে। আর এটাই ছিল মূলত গোটা বিশ্ব নাস্তিক্যবাদের প্রথম তুফান।

দুই. পুঁজিবাদী বিশ্বের অত্যাচার: গির্জার প্রভাব থেকে ইউরোপের মানুষগণ তখনও পুরোপুরি মুক্তি লাভ না করলেও বাষ্পের শক্তি আর যন্ত্র আবিষ্কারের ধারাবাহিকতা শুরু হতে না হতেই তাদের জীবনধারা সম্পূর্ণরূপে বদলে যেতে থাকে। মানুষ কৃষিকাজ বাদ দিয়ে শিল্পের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তারা তাদের বাপ-দাদার পুরনো ঐতিহ্য ছেড়ে দিয়ে শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে থাকে। এভাবে একপর্যায়ে অনেকটা রাতারাতিই তারা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যায়। সেসব শিল্প-কারখানায় শ্রমিকদের তারা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করতে থাকে। তাদের ওপর চাপিয়ে দেয় নানারকম জুলুম-অত্যাচার আর শোষণের খড়্গ। ফলে জালেম পুঁজিবাদী আর মজলুম শ্রমিক নামে মানুষ দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অত্যাচারের এই নতুন পন্থা উদ্ভাবনের ফলে, পাশাপাশি ধর্মের পতাকাবাহীদের অত্যাচারী শ্রেণীদের সহায়তা কিংবা জুলুম-অত্যাচারের ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন সাধারণ মানুষের মনে ধর্মের বিরুদ্ধে নতুন করে ক্ষোভ আর ঘৃণার আগুন জ্বালায়। এক পর্যায়ে মানুষ আল্লাহর স্তিঅস্তিত্বে সন্দেহ করতে শুরু করে। ধর্মকে তারা জুলুমের হাতিয়ার কিংবা নিদেনপক্ষ সহায়ক হিসেবে আখ্যায়িত করে। ধর্ম তাদের পার্থিব সমস্যার কোনো সমাধান দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম- এমন বিশ্বাস তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে ওঠে। আর এভাবেই মানুষের জীবন থেকে ধর্মের প্রভাব-বলয় ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে যেতে থাকে। ফলে মানুষ নিজেই নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন উপায়-উপকরণ খুঁজতে থাকে। সত্যি কথা কি- এই ক্ষেত্রেও ইউরোপের গির্জা মানুষের কোনো সহায়তা করতে পারে নি।

তিন. নাস্তিক্যবাদী অর্থনীতির গোড়াপত্তন:নাস্তিক্যবাদের তুফান বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার তৃতীয় উপকরণ ছিল নাস্তিক্যবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভাবন। আর এর মাঝে সবার আগে যে নামটি চলে আসে তা হলো ইয়াহূদী বংশোদ্ভূত জার্মান খ্রিস্টান (পরবর্তীতে নাস্তিক) কাল মার্কসের উদ্ভাবিত কম্যুনিজম। যদিও মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যই কম্যুনিজমের উৎপত্তি হয়েছিল এবং পুঁজিবাদী দুনিয়া ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধন-সম্পত্তির ধারার বিলোপ সাধন করে সকল মানুষের সমতার ওপর ভিত্তি করে সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলার

শ্লোগান নিয়ে এটা অস্তিত্বে এসেছিল; কিন্তু এর হর্তাকর্তারা ধীরে ধীরে একে ধর্মীয় পোশাক পরাতে শুরু করেন। ফলে সেখানে আস্তে আস্তে অর্থনীতির সঙ্গে দূরতম সংশ্লিষ্টতা নেই এমন বহু বিষয়েরও অনুপ্রবেশ ঘটে। এক পর্যায়ে তারা ধারণা দিতে শুরু করেন- মানুষের জীবনটা কেবল পার্থিব জগতের জন্যই। প্রভু, পরকাল কিংবা আত্মা বলতে আসলে কিছু নেই। আর তাই সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষের আগ্রহ আর আকাঙক্ষার ক্ষেত্র কেবল পার্থিব দুনিয়ার উন্নতি-অগ্রগতি। পরবর্তীতে মানুষকে আরও জানানো হয় যে, জগতের ধর্মগুলো মূলত গরীবকে শোষণের জন্য ধনীদের আবিষ্কৃত হাতিয়ারমাত্র। আমানত, সচ্চরিত্র ইত্যাদি আখলাকগুলো পুঁজিবাদী স্বার্থকে রক্ষার জন্যই চতুর মস্তিষ্কের চিন্তার প্রসবমাত্র। আর এভাবেই সাম্যবাদীদের বিশ্বাসের ভিত্তি গড়ে ওঠে জগতের সকল নবী-রাসূলের দুশমনির ওপর। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে- সমাজের সাধারণ মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে জুলুম-নির্যাতনের পথ সুগম করার জন্যই আম্বিয়ায়ে কিরাম জগতে এসব ধর্মের প্রচার করেছিলেন। আর এভাবেই অর্থনৈতিক এই বিশ্বাসটি এক পর্যায়ে সব ধর্মের দুশমন হয়ে নাস্তিক্যবাদের এক

নতুন তুফানরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আরও আগে বেড়ে বলা যায়, কম্যুনিজমই ছিল সম্ভবত নাস্তিক্যবাদের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী তুফান। কারণ কম্যুনিজমের মূল শ্লোগান আর দর্শন ছিল সমাজের সাধারণ মানুষের স্বার্থ সুরক্ষা নিশ্চিত করা। বাহ্যিকভাবে যা ছিল ইনসাফপূর্ণ ও মানবতার জন্য পরম উপকারী একটি দর্শন। আর যেহেতু সমাজের অধিকাংশ মানুষই ছিল দরিদ্র ও নিপীড়িত-নিষ্পেষিত সেহেতু নিজেদের মঙ্গল ও স্বার্থের কথা চিন্তা করে সাধারণ মানুষরা হৃদয়ের দুয়ার খুলে একে স্বাগত জানায়। এটা আসন গেড়ে বসে তাদের মনের মণিকোঠায়। বস্তুত কেবল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়; একটি ধর্মবিশ্বাস হিসেবেও এটি স্থান পেয়ে যায় তাদের মস্তিষ্কের গভীরে।আর এভাবেই নতুন একটি অর্থনৈতিক ধারার ছদ্মাবরণে নাস্তিক্যবাদ পৃথিবীতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। পরবর্তীতে রাশিয়ায় সংঘটিত বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্য ও তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাগ্রহণ ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তারা প্রকাশ্যে ধর্মের গলা কাটতে শুরু করে। নাস্তিক্যবাদ অলি-গলি ছেড়ে এবার রাজপথে নেমে হুক্কাহুয়া করতে থাকে। ধীরে ধীরে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এই প্রলয়ংকরী তুফান।

কম্যুনিজমের বিশ্বাস ছিল, গোটা পৃথিবী একসময় তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আর বিশ্বাসের কাছে অবশ্যই আত্মসমর্পণ করবে। আর সেকারণে এটা শুধু দাওয়াতের ভেতরেই তার কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ রাখেনি; গোটা বিশ্বে এই আদর্শ ছড়িয়ে দিতে এক পর্যায়ে বিপ্লব আর রক্তাক্ত সহিংসতার পথ বেছে নেয়। ফলে দ্রুত গোটা বিশ্বে এই আদর্শিক বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন জাতি নিজের অজান্তেই নাস্তিকতার পথে অগ্রসর হতে থাকে। ঠিক যেমনটা ঘটেছিল চীনে ও রাশিয়ার সীমানার ভেতরের বিভিন্ন ইসলামী প্রজাতন্ত্রে। আজও মার্কসীয় বিশ্বাসের প্রজ্জ্বলিত নাস্তিক্যবাদের এই আগুন গোটা বিশ্বে দ্রুদ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে

ছড়িয়ে পড়ছে। এমনকি ইসলামের দুর্গ হিসেবে খ্যাত আরব দুনিয়ায়ও মার্কসীয় মতাদর্শ একের পর এক হানা দিয়ে যাচ্ছে।

চার :বস্তুবাদী শক্তির সঙ্গে নাস্তিক্যবাদের মিলন: আল্লাহর অস্তিত্বে অস্বীকার আর নাস্তিক্যবাদের দিকে ছুটে যেতে মানুষকে উদ্বুদ্ধকারী আরেকটি উপাদান ছিল নাস্তিক্যবাদের সঙ্গে বস্তুবাদী শক্তির সম্মিলন। কারণ মানুষ দেখলো, যেদিন থেকে গির্জা ও গির্জার বিশ্বাসের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে আযাদ করতে পেরেছে, সেদিন থেকেই ইউরোপ তাদের ধারণা মতে জীবনের সব রহস্য আবিষ্কার করতে পেরেছে আর আরোহণ করেছে বস্তুবাদী শক্তি ও উন্নতি-অগ্রগতির সানুদেশে। একইভাবে রাশিয়াও নিজেকে নাস্তিক্যবাদী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করার পরপরই রাতারাতি পরিণত হয়েছে বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রে। তারা আরও দেখলো, যেসব রাষ্ট্র অদ্যাবধি ধর্মকে আঁকড়ে ধরে আছে, বস্তুবাদী শক্তি ও শিল্প ইত্যাদির দিক থেকে সেগুলো অন্যদের তুলনায় যোজন যোজন পেছনে পড়ে আছে। আর এভাবেই তাদের মনে বদ্ধমূল গভীর বিশ্বাস গড়ে ওঠে: নাস্তিক্যবাদই হলো শক্তি আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল চাবিকাঠি। ধর্মের নামই হলো মূর্খতা আর পশ্চাৎপদতা। পাশাপাশি বস্তুবাদী বিজ্ঞানের নানা উদ্ভাবন আর আবিষ্কারের ফলে যেহেতু মানব জীবন অধিকাংশ ক্ষত্রেই সহজতর হয়ে পড়েছিল এবং মানুষের জীবন সুন্দর ও সুখময় করার ক্ষেত্রে এর প্রভাব সুস্পষ্টভাবেই যে কোনো মানুষের চোখে ধরা পড়ার মতো ছিল, সে কারণে সহজাতভাবেই মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করে। বস্তুবাদী জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই এক সময় বসিয়ে দেয় মা'বুদের আসনে। কারণ তাদের পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, এই মা'বুদই পারবে তাদের পার্থিব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিতে। আরও আগে বেড়ে, এই নতুন মা'বুদই তাদের অন্য গ্রহে যাওয়ারও স্বপ্ন দেখাতে শুরু করে। এভাবেই নাস্তিক্যবাদের সঙ্গে নতুন নতুন আবিষ্কার আর বস্তুবাদী জ্ঞান-

বিজ্ঞানের মিলন মানুষের ভেতরে এই প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, বিজ্ঞান হলো নাস্তিক্যবাদের সহজাত ফলাফল। আর এভাবেই একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসের ছদ্মাবরণে এই তুফান মানুষের মনের দরিয়ায় ঝড় বইয়ে দিয়ে তাকে অশান্ত ও সংক্ষুব্ধ করে তোলে।

পাঁচ. ইউরোপীয় ঝড়ের মুখে ইসলামী দুনিয়া:বস্তুবাদী শক্তি আর ক্ষমতার মালিক হয়ে ইউরোপ যখন তার মাটিতে অসংখ্য শিল্প-কারখানা গড়ে তোলে, তখন এসব কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের বাজার ও কাঁচামালের সন্ধানে তারা গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। আর সেসব ভূখণ্ড যেহেতু অল্প পরিশ্রমে কিংবা সম্পূর্ণ মুফতে নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধিতে সর্বদা তৎপর ছিল, যার ফলে সেটা অর্জনের জন্য তারা তাদের সামরিক শক্তি ব্যয় করা শুরু করে। অপরদিকে কপাল খারাপ ছিল ইসলামী দুনিয়ার। এটা তখন দারিদ্র্য, পশ্চাৎপদতা, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে দুর্বলতার সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। পরিণতিতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক হামলার সামনে এটা বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। ফলে অস্ত্রের লড়াইয়ে

ইউরোপের সামনে আত্মসমর্পণ করে বসলো ইসলামী দুনিয়া। সামরিক পরাজয়ের ধারাবাহিকতা এক সময় আকীদা ও বিশ্বাসের পরাজয় পর্যন্ত গিয়ে ঠেকলো। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক নাস্তিকদের প্রচণ্ড ঝড়ের সামনে ইসলামী দুনিয়ার আকীদার ভীত নড়বড়ে হয়ে ধ্বসে পড়ার উপক্রম হলো। এক পর্যায়ে ইসলামী উম্মাহ নিজের ইতিহাস-ঐতিহ্য পেছনে ছুঁড়ে ফেলে ইউরোপীয় উপনিবেশের অনুসরণ করতে শুরু করলো। ধীরে ধীরে তাদের ভেতরে অনুপ্রবেশ ঘটলো নাস্তিক্যবাদী এই বিশ্বাসের যে, ধর্মকে পরিত্যাগ করেই ইউরোপ উন্নতির সানুদেশে পৌঁছে গেছে। গোটা বিশ্বব্যাপী নাস্তিক্যবাদের বিস্তারের ক্ষেত্রে ইসলামী দুনিয়ার এই স্খলনও ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল।

ছয়. নয়া যিন্দিগি ও সভ্যতার আড়ম্বর: পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাগরণ দুনিয়ার সামনে আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস আর প্রাচুর্যের এক নয়া দিগন্তের উন্মোচন করেছিল। চোখ ধাঁধানো বাড়ি-গাড়ি, যোগাযোগ মাধ্যমের বিস্ময়কর বিকাশ আর বিলাস-ব্যসনের সকল উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য, পোশাক-আশাকের ঔজ্জ্বল্য, উন্নত মানের খাদ্যদ্রব্যের আড়ম্বর আর জীবনের সকল ভোগ-সামগ্রীর ঘটা মানুষকে তাদের পুরনো পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ এক নতুন পৃথিবীতে নিয়ে গেলো, যেখানে ভোগের সাগরে বুঁদ হয়ে থাকা ছাড়া জীবনের আর কোনো মানে ছিল না তাদের কাছে।সন্দেহ নেই, জগতের ধর্মগুলো যেই মূলনীতির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল নতুন জীবনের এই সবকিছুই ছিল ঠিক তার বিপরীত মেরুতে। কারণ ধর্ম স্বভাবতই মানুষকে অপচয় থেকে নিষেধ করে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির পথ পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বনের দীক্ষা দেয়। মদ, ব্যভিচার ও নগ্নতাসহ সকল হারাম ও অন্যায়ের পথ বর্জনের নির্দেশ দেয়। আর এতেই মানুষ ধর্মকে ভুল বুঝলো। দীন ও ধর্মের হিকমত ও রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষ ধর্মের এই নীতিমালাকে মনে করতে লাগলো তাদের স্বাধীনতার পথের কাঁটা হিসেবে। তাদের মনে বিশ্বাস জন্মালো, ধর্ম তাদের স্বাধীনতার পায়ে শেকল পরিয়ে দিতে চায়। তাদের ভোগ-বিলাসের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে চায়। ফলে এভাবে ধর্মের প্রতি তাদের বিতৃষ্ণা ও বিরাগ আরও বেড়ে গেল। অধিকন্তু, ধর্মের পথে আহ্বানকারীরাও তাদের দুশমনে পরিণত হলেন। যে ব্যক্তিই জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে তাদের জান্নাতের দিকে উদ্বুদ্ধ করতো তাকেই তারা ঘৃণা করতে শুরু করলো। আর এভাবেই দিনে দিনে ধর্ম-বিশ্বাস মানুষের মধ্য থেকে বনবাসে চলে গেলো। মানুষের মনের আসনটি দখল করে নিলো নাস্তিক্যবাদ।

সাত. বিরামহীন জীবনের নাগরদোলা : পশ্চিমা সভ্যতা জীবনকে উপভোগের যেই দুয়ার পৃথিবীর সামনে খুলে দিয়েছিল তাতে গোটা মানব জাতি উন্মাদ হয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো। জীবনের ভোগ-বিলাসের হাজারও উপায়-উপকরণ দেখে মানুষের মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম হলো। সেগুলোর ভোগ-সম্ভোগের পথে দৌড়াতে গিয়ে একসময় মানুষ তার চারপাশের সবকিছু বরং একদিন নিজেকেও ভুলে গেলো। জীবনকে সহজ করার জন্য অতিরিক্ত অর্থের

প্রয়োজন হলো। আর এই চাহিদা মেটাতে গিয়ে মানুষ তার পরিশ্রম আর কর্মের পরিধিও আরও বিস্তৃত করলো। একসময় পুরুষের একার শ্রম পরিবারের ব্যাপক চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হলে একসময় অন্তঃপূরের নারীও পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার জন্য ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে নেমে এলো। জীবনের প্রলুব্ধকর হাতছানিতে সাড়া দিয়ে ভোগের সাগরে বুঁদ হয়ে থাকার জন্য প্রয়োজন হলো আরও অর্থ ও প্রাচুর্য্যের। ফলে মানুষ আরও বাড়িয়ে দিলো তার কাজের গতি। এভাবে মানুষ একসময় মেশিনে পরিণত হলো। জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যার কাজই দিন-রাত কেবল ঘুরতে থাকা। ফলে একদিন মানুষ তার নিজেকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনার সময়টুকুও হারিয়ে ফেললো। নিজের স্থান ও অবস্থান, নিজের পরিচয় ও গন্তব্য এসব নিয়ে ভাবার কোনো সুযোগই তার রইলো না। ভোর হতেই সে কাজে নেমে যায়। দিনের শেষ প্রান্তে কাজের শেষে চলে যায় মনের চাহিদা মেটাতে ভোগ-বিলাসের সন্ধানে। এটাই পরিণত হয় তার প্রাত্যহিক রুটিনে। ফলে ধর্ম নিয়ে চিন্তা-ভাবনার কথাও মানুষ একসময় ভুলে যায়। মানুষের জীবনে স্বাভাবিকভাবে তৈরি সহজাত কিছু প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার কথাও তার মনে পড়ে না। তার ভাবনাতেও কোনো দিন আসে না: কে এই পৃথিবীর স্রষ্টা? আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন? আর কেনই বা সৃষ্টি করেছেন? আমাদের গন্তব্য কোথায়? এই পৃথিবীর কোনো শুরু বা শেষ আছে কি? মানুষের মাঝে ধনী-গরীব, জালেম-মজলুম আর হত্যাকারী ও নিহতের এই শ্রেণীভেদ কেন? সত্যি কথা হলো, জীবন-চক্রের অবিরাম ঘূর্ণন তাকে এগুলোর জবাব খোঁজার অবসরটুকুও দেয়নি।এইগুলো ছিল তাদের মতে নাস্তিক্যবাদের প্রাদুর্ভাব ও দুনিয়াব্যাপী তার ভয়ংকর সয়লাবের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

এছাড়াও নাস্তিক্যবাদের অনেক কারন রয়েছে। যেমন,

পারিবারিক কারন : একটা পরিবারের প্রধান সদস্য যদি নাস্তিব্যবাদে বিশ্বাসী হন তাহলে পুরো পরিবারে এর প্রভাব পড়ে।সবাই এই বিশ্বাসে জড়িয়ে পড়তে পারেন। অথবা যেকোনো একজন সদস্য যদি কোনোভাবে নাস্তিক্য হয়ে পড়েন, সে অন্য সদস্যদেরকেও প্রভাবিত করতে পারেন। পারিবারিক নৈতিক এবং ধর্মীয় শিক্ষার অভাব এর অন্যতম কারন। যখন একজন শিশু জন্মগ্রহন করে, এবং বেড়ে ওঠার সাথে সাথে পারিবার থেকে ধর্মীয় শিক্ষা যদি না পায় , তাহলে খুব সহজেই সে নাস্তিক্যবাদের মারাত্নক ফাঁদে পড়ে যেতে পারেন। তাই পারিবারিক পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

সামাজিক কারন : নাস্তিব্যবাদ বিস্তারে সমাজেরও ভুমিকা রয়েছে ।একটি সমাজের বেশির ভাগ সদস্য যদি নাস্তিক হন, তাহলে তারা পুরো সমাজকেই কোনো না কোনো ভাবে নাস্তিব্যবাদের দিকে আহ্বান করতে পারেন। সেটা হতে পারে কখনো অপব্যাখ্যা দ্বারা বা কখনো বল প্রয়োগের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির ইমান যদি দুর্বল হয় তাহলে সে খুব সহজেই নাস্তিব্যবাদীদের ফাঁদে পা দিবেন এটাই স্বাভাবিক।

সঙ্গদোষ: সঙ্গদোষ নাস্তিক্যবাদ বিকাশের আরো একটা কারন। একজন আস্তিক ব্যক্তি যদি দীর্ঘদিন ধরে কোনো নাস্তিক বন্ধু, সহপাঠী, সহকর্মীর সাথে ওঠাবসা করে, চলাফেরা করে, একই সেক্টর কাজ করেন, তাহলে সে খুব সহজেই তার নাস্তিক সঙ্গীদের দ্বারা প্রভাবিত হতে

পারেন। তাদের মনোভাব, চিন্তাচেতনা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। তাদের ইসলামের যাবতীয় বিষয় (আল্লাহ, কিয়ামত, আখিরাত, কোরআন) সম্পর্কে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির মনে নাস্তিব্যবাদের বীজ বপন করতে পারেন।এতে ঐ ব্যক্তি খুব সহজেই নাস্তিক হয়ে যেতে পারেন।
আধুনিক বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তির প্রভা্ব : বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এখন পুরো পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছেন। মানুষ সমুদ্রের গভীর তলদেশ যেমন ভ্রমন করে জ্ঞান আহরন করছেন, তেমনি মহাকাশে ভ্রমন করেও আবিষ্কার করছেন অজানা সব তথ্য। বিজ্ঞানের উন্নতির কারনে মানুষের জায়গায় এখন ব্যবহৃত হচ্ছে বোরট। তারা মানুষের মতোই সকল কাজ অতি সহজে অভিজ্ঞতার সাহায্যে করে দিচ্ছে। যার কারনে মানুষের জিবন হয়ে উঠেছে বিজ্ঞান নির্ভর। যার কারনে মানুষ এখন ধর্মীয় নৈতিকত্ থেকে দিন দিন দুরে সরে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের উন্নতির কারনে তারা কোরআনের অপব্যাখ্যা করছে এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার দিয়ে তারা পুরো পৃথিবীকে নিজের নিয়ন্ত্রনে আনতে চাই যেটা তাদের একটা বোকামি। আর বিজ্ঞানের এই শক্তির ওপরে তাদের আস্থা, তাদেরকে স্রষ্টার বিশ্বাস থেকে দুরে সরিয়ে নাস্তিব্যবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
নৈতিক শিক্ষাবিহীন উচ্চশিক্ষা : নৈতিক শিক্ষাবিহীন উচ্চশিক্ষা নাস্তিক্যবাদের আরো একটা উল্লেখযোগ্য কারন।বর্তমান যুগে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের কারনে জ্ঞান অর্জনের গন্ডি অনেকদুর পর্যন্ত পৌছিয়ে গিয়েছে। মানুষ জ্ঞান অন্বেশনের জন্য নিজ দেশের গন্ডি পেরিয়ে বাইরের বিভিন্ন দেশের বড় বড় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য পাড়ি জমাচ্ছে। এই উদ্দেশ্য কখনো কখনো তারা এমন দেশে যান, যেখানে নাস্তিক্যবাদের সয়লাব।
একজন মানুষ যখন দীর্ঘদিন নাস্তিকদের দেশে অবস্থান করবে, তাদের সংস্কৃতির সাথে মিশবে, তাদের চাল চলন ,আচার আচরন, রীতি নীতি, ঐতিহ্যের সাথে মিশবে ,তখন তার ওপর এগুলোর প্রভাব পড়বেনা এমনটা ভাবা অসম্ভব।
দেখা যায় এক পর্যায়ে সেই ব্যক্তি ঐ সংস্কৃতি রপ্ত করতে শুরু করে এবং তার চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারনাতে ঐ দেশের সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে। এমনি সেও নাস্তিক্যতাবাদের অনুসারী হয়ে যেতে পারে।

আবার, উচ্চশিক্ষার জন্য অনেক সময় রোমান,গ্রিক ইত্যাদি প্রাচীন সভ্যতার সাহিত্যে ,ইতিহাস, দর্শন এগুলো পড়তে হয় কোর্স হিসেবে। এই বিষয়গুলোতেও অনেক পি.এইস.ডি সহ অনেক বড় বড় গবেষনা করে থাকেন। আর এসবের মুলে রয়েছে সক্রেটিস ,এরিস্টটল, প্লেটো ইত্যাদি দার্শনিকদের অবদান যাদেরকে উইকিপিডিয়াতে প্রাচীন নাস্তিক বলা হয়েছে।

তাদের দার্শনিক চিন্তাভাবনা ধর্ম থেকে অনেক দুরে। কারন তারা নিজেদের মনগড়া যুক্তির মাধ্যমে সবকিছু বিচার করতো। যারা এসব বিষয়ের ওপর দীর্ঘদিন অধ্যায়ন করতে থাকে, তাদের মনের ওপর এর প্রভাব খাইরাসের মতো ছড়িয়ে পড়তে পারে আর তারা এর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন। এভাবে ধর্মীয় শিক্ষাহীন জ্ঞানও মানুষকে নাস্তিক্যতাবাদের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

নাস্তিক্যবাদের বিস্তারের প্রভাব

নাস্তিব্যবাদ এক ভয়ানক বিষধর সাপের মতো যার ক্ষতিকর প্রভাব ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ,রাষ্ট্র, ইহকাল ও পরকাল পর্যন্ত বিস্তৃত।এটা শুধু ব্যক্তিবিশেষের জন্য ক্ষতিকন তা নয়, বরং তার আশপাশ সবকিছুকেই এটা আচ্ছন্ন করে ফেলে। এতে ব্যক্তি যেমন মানসিকভাবে দ্বন্দ্ব, অস্থিরতায় ভোগে, তেমনি সে পরিবার,সমাজের ওপরেরও প্রভাব পড়ে। নাস্তিক ব্যক্তি তার নিজের জন্য,পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য হুমকিস্বরুপ। নাস্তিক্যবাদে ভয়ানক প্রভাব সম্পর্কে আব্দুর রহমান আব্দুল মালেক বেশ কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন , যেটা মিযান ইবনে হারুন বর্ননা করেছেন। তন্মধ্যে কিছু প্রভাব হলো মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অনিঃশেষ অস্থিরতা, ব্যক্তিচিন্তা ও স্বার্থপরতা, জিবনের লাগামহীনতা ও অপরাধ প্রবণতা, পারিবারিক ব্যবস্থার বিলপ্তি, সমাজ ব্যবস্থার বিলাপ, রাজনৈতিক অপরাধ ইত্যাদি।

এক. মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অনিঃশেষ অস্থিরতা:

নাস্তিক্যবাদ একজন মানুষের জীবনে যেসব অভিশাপ আর সর্বনাশ ডেকে আনে তার ভেতরে সবার প্রথমেই আসে মানুষের মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও পেরেশানী, মনের চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা। প্রত্যেকটি মানুষের ভেতরে সহজাতভাবে কিছু প্রশ্ন জাগবে এটাই স্বাভাবিক? কেন আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে? কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন? আর আমি যাব-ই বা কোথায়? এটা ঠিক যে যান্ত্রিক জীবনের অবিরাম ঘূর্ণন মানুষকে অধিকাংশ সময়ই এসব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা-ভাবনার সময় দেয় না। কিন্তু তারপরেও কখনো কখনো মানুষ জীবনে চলার পথে ধাক্কা খেয়ে নিজের অজান্তেই এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে থাকে। বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ আর রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কিংবা বন্ধু-বান্ধব ও কাছের মানুষ হারিয়ে হঠাৎ মানুষের মনখানি ব্যাকুল ও উদাস হয়ে ওঠে। এভাবে ছন্দময় জীবনে হঠাৎ যখন ছন্দপতন ঘটে, তখন মানুষ নিজের অস্তিত্ব ও গন্তব্য নিয়ে চিন্তা-ফিকির করতে বাধ্য হয়। কিন্তু আল্লাহর স্তিঅস্তিত্বে অস্বীকারের তথাকথিত নড়বড়ে ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা নাস্তিক্যবাদ যেহেতু এসব প্রশ্ন ও তার জবাব সম্পর্কে নিতান্তই অজ্ঞ, সেহেতু এটা কোনো দিনও মানুষকে এসব প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে সক্ষম হয় না। ফলে জীবনের এসব প্রশ্ন মানুষের মনে ধাঁধা হয়ে ভয়-ভীতি ও পেরেশানীর জন্ম দেয়। এটা সর্বদাই তার বিবেককে যন্ত্রণার আগুনে জ্বালাতে থাকে।

একসময় পৃথিবীর মানুষ দৈনন্দিন কাজ-কর্মের বিরতিতে আকাশ-পাহাড়, সাগর-নদী আর বন-বনানী নিয়ে মেতে উঠতো। ফুলের বাগান আর ফুলের সঙ্গে সখ্যতা গড়তো। বনের পাখির সঙ্গে গান গাইতো। প্রাকৃতিক এসব সৌন্দর্য কখনো কখনো তাকে নিজ স্রষ্টা আর রবের পরিচয় পেতে সাহায্য করতো। এগুলোর পরশ পেয়ে এক সময় সে আপন প্রভুর সান্নিধ্যের শিহরণে ধন্য হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজ মানুষের পুরো সমাজ ও আশপাশের সবকিছুই যান্ত্রিকতায় পরিণত হয়েছে। আজ মানুষ তার চারপাশের যেদিকেই তাকায় আকাশচুম্বী দালান-কোঠা, যানবাহনের কান-ফাটা চেঁচামেচি ছাড়া কিছুই দেখতে ও শুনতে পায় না। সড়কের চোখ ধাঁধানো আলোকমালা তার মনের

আভাটুকু কখন কেড়ে নিয়ে গেছে তা সে নিজেও জানে না। আর এভাবেই সে তার রব সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার প্রাকৃতিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তার পেরেশানী কেবল বাড়তেই থাকে।

প্রাচীন কালের সমাজ ব্যবস্থায়ও ছিল সহজতা আর সারল্যের এক অনুপম সৌন্দর্যের শোভা। সেখানে পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতা ছিল সুন্দর সমাজের একটি অনস্বীকার্য উপাদান। বিপদ-আপদে একে অপরের কাছে ছুটে আসা, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, সুখ ও দুঃখকে পরস্পর ভাগাভাগি করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বেঁচে থাকা ছিল সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের বাস্তব চিত্র। কিন্তু আধুনিক সমাজে মানুষ নিজের দুঃখের কাহিনী শোনানোর জন্য কাউকে খুঁজে পায় না। নিজের অস্থিরতার কথাগুলো বলার জন্য কোনো সুহৃদ দেখতে পায় না। জীবন পথে চলতে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে কেউ যে তাকে হাত ধরে উঠাবে এমন কোনো আশার আলো তার চোখে পড়ে না। আর সেকারণেই ভবিষ্যৎ নিয়ে তার এতটা ভয়, এতটা অনাস্থা। সেই ধারাবাহিকতায় সমাজের সবগুলো মানুষ কেবল নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন-নিয়ে দুই হাত ভরে ধন-সম্পদ উপার্জনের জন্য ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়ে। এখানে বোঝার চেষ্টা করুন, যদি এই অবস্থায় মানুষ আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করতো, তবে সে ভবিষ্যতের জন্য এতটা পেরেশান আর ব্যাকুল হয়ে উঠতো না। কারণ সে আল্লাহর ওপর ভরসা করে স্বাভাবিক গতিতেই পথ চলতো। আর এই বিশাল সমস্যার সমাধানও হয়ে যেতো অতি সহজে। কিন্তু নাস্তিক্যবাদ এই সমস্যার কোনো সমাধানই দিতে পারেনি। কারণ এর মতে, মানুষই তো তার সবকিছুর স্রষ্টা। সুতরাং এসব সমস্যার সমাধানও তাকেই বের করতে হবে। আর এভাবেই সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই ব্যক্তিচিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে চরম স্বার্থপর।

দুই. ব্যক্তিচিন্তা ও স্বার্থপরতা:

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক অজানা ভীতি ও শঙ্কা আর মানসিক পেরেশানী ও অস্থিরতার অনিবার্য পরিণতি এই যে, সমাজের মানুষগুলো সতত আত্মচিন্তামগ্ন ও চরম স্বার্থপর হয়ে পড়বে। অন্যের চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়ে সদা-সর্বদা নিজের স্বার্থসিদ্ধির চিন্তাই হবে তার দিন-রাতের

সাধনা। কারণ ধর্ম মানুষকে সব সময় অন্যের জন্য নিজের সাধ্যমতো ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহর রিযামন্দি লাভ করতে হলে পরের কল্যাণে পূর্ণ নিবেদিত হতে হবে- এমন দীক্ষা দেয়। কিন্তু অপরের কল্যাণকামিতা, দয়া ও মমতা প্রদর্শন আর পরহিতব্রতের উৎসমূল সেই ধর্মই যখন মানুষের জীবন থেকে বিদায় নেয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার জায়গা এসে দখল করে ব্যক্তিচিন্তা ও আত্মপরায়ণতা। সেকারণেই নাস্তিক্যবাদী সমাজে আমরা দেখতে পাই, সেখানে কেউ কারও সাহায্যে এগিয়ে আসে না। দরিদ্র ও গরীব মানুষের প্রতি কেউ সহমর্মিতা ও মমত্ববোধ দেখায় না। এভাবে একসময় স্বার্থপরায়ণতার পরিধি বাড়তে থাকে। মানুষ স্বীয় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এমনকি স্ত্রী-পরিবার ও বাবা-মাকেও ভুলে যায়। পরের মঙ্গলের জন্য সে কেবল তখনই চিন্তা করে, যখন সেটা তার স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রেও কাজে আসে। স্বার্থপরতার এই সয়লাবের ক্ষেত্রে মানুষকে আরও সামনে ঠেলে দেয় পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি তার বিশ্বাস ও চিন্তাধারা। নাস্তিক্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় যেহেতু জীবনের সবধরনের বিলাস-ব্যসনকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে, সে কারণে মানুষ সেসব ভোগে নিজেকে জড়িয়ে নিতে স্বার্থচিন্তা বাদ দিয়ে আর কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করে না। কারণ সে খুব ভালো করেই জানে, পরের জন্য চিন্তা এ ক্ষেত্রে তার কোনোই উপকারে আসবে না। আর এভাবেই গোটা বিশ্বে এ মহামারী ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের চেয়েও দ্রুত গতিতে।

তিন, জীবনের লাগামহীনতা ও অপরাধ-প্রবণতা :

নাস্তিক্যবাদ মানুষের মন ও মননকে সঠিক ও সুস্থভাবে প্রতিপালন করে না। তাকে ভালো ও সৌন্দর্যের দীক্ষা দেয় না। কোনো দিনও তাকে তার রবের ভয় দেখায় না, যিনি নিরন্তর তাকে দেখে চলেছেন। তার প্রতিটি কর্মকাণ্ডের বিন্দু-বিসর্গ সম্পর্কেও পূর্ণ অবগত রয়েছেন। একারণেই একজন নাস্তিক রূঢ়-স্বভাব ও অনুভূতিহীন হয়ে বেড়ে ওঠে। ফলে তার গোটা জীবনটা হয়ে ওঠে নিয়ন্ত্রণশূন্য ও লাগামহীন। অন্যায় ও অপরাধ থেকে তাকে ফিরিয়ে রাখার মতো কোনো বস্তু তার ভেতরে থাকে না। ন্যায় ও সততার প্রতি তাকে কোনো কিছু উদ্বুদ্ধ করে না। বরং এর বিপরীতে নাস্তিক্যবাদ তার কানে কানে প্ররোচিত করে যে, এ পৃথিবীতে তুমি এভাবেই হঠাৎ করে চলে এসেছো। তোমাকে কেউ সৃষ্টি করেনি অথবা তুমি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছো। আর পৃথিবীতে তুমিও লাখো প্রাণীর মতো একটি প্রাণী। ফলে তার ভেতরে ধীরে ধীরে জন্তু-জানোয়ারের গুণাবলী বেড়ে উঠতে থাকে। ওভাবেই সে নিজেকে প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু কখনো কখনো যদি সমাজ কিংবা পরিস্থিতি তার স্বার্থসিদ্ধির পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে সেই কাঁটা উপড়ে ফেলতে বিভিন্ন কলা-কৌশল কিংবা জোর-জবরদস্তিতার আশ্রয় নেয়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাকে পূর্ণরূপে লাগাম পরানোর মতো কেউই থাকে না। কারণ সে কোনো রবকে ভয় করে না। কারও কাছে জবাবদিহির কোনো চিন্তা করে না। তাহলে তার আর দুশ্চিন্তার জায়গাটা কোথায়? হাঁ, কখনো কখনো সামাজিক নিয়ম-নীতি কিংবা মানবীয় আইন-কানুন তার স্বার্থ হাসিলের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখেন এমন যে কারও কাছে স্পষ্ট যে, সেই প্রতিকূলতা দূর করতে তার খুব বেশি কাঠখড় পোড়াতে হয় না। আবার কখনো কখনো মানবিক প্রবৃত্তি কিংবা মানুষের সহজাত বিবেকবোধ তার অনুভূতিতে নাড়া দেওয়ার চেষ্টা করে, ভেতর হতে তাকে অপরাধ থেকে ফেরানোর জন্য কখনো কখনো ডাক দিয়ে যায়, কিন্তু বাস্তবে এগুলো কি তাকে তার পথ থেকে ফিরাতে পারে? আসল কথা হলো, নিরন্তর ধাবমান জীবন চাকার গড়গড় ঘূর্ণনের মাঝে বিবেকবোধ আর হৃদয়ের গভীর থেকে ভেসে আসা অনুচ্চকিত সেই আওয়াজ নিমেষেই বাতাসে মিলিয়ে যায়।

মানব জীবনে নাস্তিক্যবাদের এই প্রভাবটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। কারণ আজ আমাদের গোটা পৃথিবীটা অপরাধ আর অন্যায়ে ভরপুর একটি পৃথিবীতে পরিণত হয়েছে। প্রতিটিদিনই সংবাদপত্র আর রেডিও-টিভিতে জঘন্যতম অন্যায়-অপরাধের এমনসব খবর প্রচারিত হচ্ছে, যা ভাবতে গেলেও গা শিউরে ওঠে। চরম সহিংসতা, বিকৃত যৌনাচার, মানুষের রক্তপান, অপরকে নির্যাতনের মাধ্যমে স্বাদ গ্রহণ আর স্বগোত্রীয় মানুষের কলজে-ছেঁড়া আর্তনাদের সামনে বিকৃত অট্টহাসির মতো পশুত্বের অস্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ আজকের মানব সমাজের প্রতিদিনকার স্বাভাবিক চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। চুরি-ডাকাতি আর হত্যা-লুণ্ঠন দিনে দিনে অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৭৭ সালে নিউইয়র্কের এক রাতে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার ঘটনার কথাই ধরুন। সকালে পৃথিবী আবিষ্কার করলো, হাজার হাজার ঘর-বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক আর দোকান-পাট সম্পূর্ণ লুট হয়ে গেছে। আর এই সংঘবদ্ধ চুরিতে সমাজের সব বয়সের সব ধরনের পেশার মানুষ যুক্ত ছিল। মোটকথা- যে যেখানে যা কিছু পেয়েছে সেটাই নিয়ে গেছে। এমনকি পুলিশ বাহিনী- যাদেরকে মানুষের জান-মাল সুরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে- সেই রক্ষকরাও ভক্ষকের ভূমিকা নিয়ে ইচ্ছেমতো এই চুরির উৎসবে অংশগ্রহণ করেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি কোনোভাবে সপ্তাহব্যাপী এখানে বিদ্যুৎ না থাকতো, আর সেনাবাহিনীও এখানে কোনো রকমের ভূমিকা না নিতো, তবে এক সপ্তাহ পরে গোটা শহরসুদ্ধ লুট হয়ে যেতো। সুতরাং যদি বিভিন্ন রাজনৈতিক সংকট ইত্যাদিতে কিংবা যুদ্ধঘন পরিস্থিতিতে এই সমাজের একে অপরকে খেয়েও ফেলে- তবে তাতে আশ্চর্যের কী আছে? মূলত এসবকিছুই নাস্তিক্যবাদের অনিবার্য ফলাফল।

চার. পারিবারিক ব্যবস্থার বিলুপ্তি:

নাস্তিক্যবাদ মানুষের সামাজিক জীবনে ধ্বংসের কুঠার হয়ে গোড়া কেটে দিয়েছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা থেকে দূরত্ব কেবলমাত্র মানুষের ব্যক্তিজীবনেই প্রভাব ফেলে না; বরং স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রভাব বিস্তৃত হয় তার সামাজিক জীবনে এবং সেটাকে গুঁড়িয়ে দেয়। একটি সুন্দর মানব সমাজের অবকাঠামো তৈরি হওয়ার জন্য শর্ত হলো সেখানে লাগানো ইটগুলো হতে হবে সুন্দর

ও ভালো। যদি ভিত্তিমূলই ভালো না হয়, ভবনের মূল উপকরণই যদি সুস্থিত ও মজবুত না হয় আর পরবর্তীতে সেই ভবন গড়ে উঠতে না উঠতেই কাত হয়ে পড়ে, তবে তাতে বিস্ময়ের কী থাকে?

মানবীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রধান উপাদান হচ্ছে পরিবার। আর সেই কারণে যখন সুন্দর ও সুস্থ মানবতা নষ্ট হয়ে যায়, তখন পারিবারিক বন্ধনও অসুস্থ ও অসুন্দর হয়ে পড়ে। একটি পরিবারের প্রধান পুরুষ স্বামীর স্বভাব নষ্ট হলে সেই নষ্টামি স্ত্রী পর্যন্ত এবং সেখান থেকে সন্তানদের প্রতি গড়ানোই স্বাভাবিক। একইভাবে পরিবারের স্ত্রীর ভেতর যদি আল্লাহর ভয় না থাকে, নিজের কাজকর্মে তাকে মনে না রাখে, তবে এর প্রভাব অনিবার্যভাবেই স্বামী-সন্তানদের ওপর পড়ে। আর এভাবেই একজন মন্দ মানুষের কারণে একসময় গোটা পরিবার নষ্ট হয়ে পড়ে। নাস্তিক্যবাদ ঠিক সেই ধ্বংসের কাজটাই করেছে নিপুণভাবে। আর সে কারণেই বর্তমান নাস্তিক্যবাদী সমাজে আমরা এমন কোনো পরিবারের সন্ধান পাই না যার সবগুলো অঙ্গ সঠিক ও সুস্থভাবে কাজ করছে। যেই পরিবারের সকল সদস্যের মাঝে সুন্দর ও সুষম ভারসাম্য রয়েছে। আর যখন সুষম পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়, তখন স্বাভাবিকভাবে একটি অসুস্থ পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের তাৎপর্যও হারিয়ে যায়। তাৎপর্যহীন সেই সম্পর্কের ভেতরে তখন থাকে কেবল স্বার্থসিদ্ধি আর ভোগ-সম্ভোগের গরজ। সেখানে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা, নিখাঁদ ভালোবাসা কিংবা ত্যাগ ও কুরবানীর ছিঁটেফোঁটাও থাকে না। পরিবারের কল্যাণ্যের জন্য একজন স্বামী কিংবা বাবা যে নিজের সকল স্বার্থ ও সাধকে কুরবানী দিয়ে দিতে পারেন, একজন নিষ্ঠাবান স্ত্রী যে কখনো জীবনের চক্রাবর্তে কেবল ভালোবাসার তাগিদে একজন হতদরিদ্র, অসুস্থ ও সাধারণ স্বামীর ঘর করতে পারেন, সয়ে যেতে পারেন সন্তানদের প্রতিপালনসহ জীবন-যুদ্ধের সবধরনের সংগ্রাম ও সাধনা- এগুলো একটি নাস্তিক্যবাদী পরিবারে কল্পনাও করা যায় না। পরকালের হিসাব-নিকাশ আর ভালো-মন্দ পরিণতিতে অবিশ্বাসী একটি পরিবারের ভেতরে কখনো ত্যাগ-তিতিক্ষার মন-মানসিকতা সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ তখন কুরবানী করে কী লাভ- এই প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া যায় না। একইভাবে সন্তানদের কথাও ধরুন। আল্লাহ তা'আলায় বিশ্বাসী একজন সন্তান জানে, তার পিতা-মাতার বার্ধক্য কিংবা দুরবস্থায় তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সে আদিষ্ট। কিন্তু সে যদি আল্লাহ তাআলার ওপরই বিশ্বাস না করে, তবে এত কষ্ট সে কোনো দিনও করতে যাবে না। ব্যক্তিস্বার্থ কাজ না করলে মাতা-পিতার দিকে ফিরেও তাকাবে না। এভাবেই নাস্তিক্যবাদের প্রাদুর্ভাবের মধ্য দিয়ে পারিবারিক বন্ধনে মূল যেই সুতোখানি থাকে সেটাই ছিঁড়ে টুকরা টুকরা হয়ে গেছে।

নাস্তিক্যবাদ পারিবারিক বন্ধনের এতখানি ক্ষতি করেও নিরস্ত থাকেনি; বরং এটা আরও সামনে এগিয়ে গিয়ে সর্বনাশের এমন সবদিক উন্মোচিত করেছে যা ভাবতেও অবাক লাগে। জীবনের

ভোগ-বিলাস পূর্ণ মাত্রায় আস্বাদন করতে গিয়ে, কামচরিত্র পূরণের পথে দৌড়াতে গিয়ে একজন অবিশ্বাসী মানুষের কাছে বৈবাহিক ও পারিবারিক বন্ধন ধরে রাখার বিষয়টিও বোকামি ও নির্বুদ্ধিতা বলে মনে হয়। কখনো কখনো তাই পুরুষরা ভাবতে থাকে যে, পরিবারের সবগুলো সন্তান তার ঔরসেই যে হয়েছে এমনটি নাও হতে পারে। একইভাবে পরিবারের সন্তানরা ভাবতে থাকে, তাদের সবাই একজন পিতার ঔরসে নাও হতে পারে। আর এভাবেই একটি সুস্থ ও সুন্দর পরিবারের সদস্যদের এক ও অভিন্নপ্রাণ হওয়ার নান্দনিক অনুভূতি সবার মাঝখান থেকে হারিয়ে যায়। শারীরিক ভোগ-সম্ভোগের সুযোগ পেলেও, দৈহিক সুখে শিহরিত হয়ে উঠলেও তারা চিরদিনের জন্য বঞ্চিত থাকে মনের সুখ আর হৃদয়ের প্রশান্তি থেকে। কারণ তাদের সম্পর্ক থাকে তখন কেবল পশুর সম্পর্কের মতোই। যার কারণে তালাক ও বিচ্ছেদ, ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হওয়া, এমনকি নিজের জীবন সঙ্গীর সঙ্গে খেয়ানতের মতো সর্বনাশা ঘটনাগুলোও অতি সহজেই প্রাত্যাহিক ঘটনার মতো সেখানে ঘটে থাকে। পিতা তার মেয়ের সঙ্গে ছেলেবন্ধুদের দেখে তাকে স্বাধীনতার প্রতি আরও উদ্বুদ্ধ করেন। ছেলের সঙ্গে তার মেয়েবন্ধুদের দেখেও না দেখার ভান করেন। কারণ নাস্তিক্যবাদ তাদের শিক্ষা দিয়েছে, প্রত্যেকে তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী জীবন চালাবে। প্রত্যেকে তার নিজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সুতরাং অপরে কী করছে- সেটা দেখার দায়িত্ব তার নয়। আর এভাবেই পরিবারিক ব্যবস্থাকে সে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে।

পাঁচ. সমাজ ব্যবস্থার বিনাশ

আমরা আগেই বলে এসেছি, পরিবার হলো সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক উপকরণ। সুতরাং পরিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংসের ফলে সমাজ ব্যবস্থায়ও যে ধ্বংস ও বিলুপ্তি নেমে আসবে সেটা বলাই বাহুল্য। কেননা একটি পরিবার প্রতিনিয়ত সমাজকে নতুন নতুন সদস্য সরবরাহ করে। সুতরাং পরিবার যদি সমাজের কাছে নষ্ট ও বিপথগামী সদস্য সরবরাহ করে, তবে সন্দেহ নেই একসময় পুরো সমাজ নষ্ট ও বিপথগামী হয়ে পড়বে। একটি সামাজিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিই হয়ে থাকেন কোনো অফিসের সবচেয়ে বড় কর্মকর্তা, হাসপাতালের চিকিৎসক, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কিংবা শিল্প-কারখানার কর্মচারী। আর তাই সর্বত্রই এই মানুষটিকে তার আশ-পাশের মানুষের সঙ্গে সেভাবেই আচার-আচরণ করতে হয় যা ছোটবেলা থেকে তার পরিবার তাকে শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং ছোট বেলা থেকে পরিবারে সে যদি কেবল ব্যক্তিচিন্তা আর স্বার্থপরতা শিখে থাকে তবে সমাজেও তো সে ঠিক একইরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। ফলে গোটা সমাজটাই হয়ে পড়বে স্বার্থপর ও আত্মপরায়ণ সমাজ। পরস্পরের ভালোবাসা ও সহমর্মিতার অনুভূতি, জনহিতৈষী মনোভাব, অপরের কল্যাণে নিজের স্বার্থকে কুরবান করে দেওয়ার মানসিকতা সেই পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয়ে যাবে। সরকারি অফিস-আদালত, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো পরিণত হবে কেবল স্বার্থসিদ্ধি ও ব্যক্তিগত গরজ পূরণের বাহন হিসেবে। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই খুঁজতে থাকবে দুর্নীতি আর অন্যায় প্রভাব

খাটিয়ে উদ্দেশ্য হাসিলের নতুন নতুন পন্থা ও পদ্ধতি। আইনের চোখ ফাঁকি দিয়ে ঘুষ-উৎকোচ গ্রহণ আর রাষ্ট্রের সম্পদ নিজের বাপের রেখে যাওয়া মীরাস মনে করে চোখ বন্ধ করে গিলতে থাকবে।

নাস্তিক্যবাদের প্রভাবে আমাদের আধুনিক মানব সমাজ 'পশু' সমাজের সঙ্গেই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে গেছে। যেখানের প্রত্যেকেই একে অপরকে শিকারের নেশায় সারাক্ষণ ওত পেতে থাকে। আর সে কারণে যেখানকার দুর্বলরা চায় সবলদের চোখ এড়িয়ে থাকতে। আর সবলরা চায় কলে-কৌশলে দুর্বলদের ঘাড় মটকাতে।

আজকের পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানেন, অপরাধ সেখানে একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এটা সেখানে মানুষের দৈনন্দিন গতানুগতিক আচারের অপরিহার্য অনুসঙ্গে রূপ নিয়েছে। সেকারণে, ব্যভিচার ও বিকৃত যৌনাচারের দরজা ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত থাকার পরেও সেখানে নারী অপহরণের হার রীতিমতো ভীতিকর। কর্মসংস্থানের প্রচুর সুযোগ-সুবিধা আর ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন পেশার মানুষ কর্তৃক চুরি-ডাকাতি আর সশস্ত্র ছিনতাই অহরহই ঘটছে। শহরগুলোতে শত শত অপরাধ সংঘটন আজ নিতান্তই একটা স্বাভাবিক চিত্র হয়ে গেছে।

এভাবেই আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও ভীতি থেকে উদাসীন নাস্তিক্যবাদী একটি সমাজ কখনো সুস্থ ও সবল সমাজ হিসেবে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকতে পারে না; বরং সেটা পরিণত হয় একটি অন্যায়, অশ্লীলতা, পাপাচার আর নীতিহীনতার ভাঁগাড়ে। অন্যায়-অপরাধ, জুলুম-নির্যাতন, আইনের চোখ ফাঁকি দিয়ে স্বার্থসিদ্ধি, অন্যায় প্রভাব খাটিয়ে কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জন ইত্যাদি তখন হয়ে পড়ে সেটার নিত্য-নৈমিত্তিক চিত্র। সেখানে সবলরা দুর্বলদের ওপর জুলুম করে। আর দুর্বলরা সবলদের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য মুনাফেকির আশ্রয় নেয়। আর এগুলোই তখন পরিণত হয় সেই সমাজের মানুষের আচার-আচরণের মূলনীতি আর অলিখিত সংবিধানে।

ছয়. রাজনৈতিক অপরাধ

নাস্তিক্যবাদের প্রভাব সম্ভবত সবচেয়ে বেশি দেখা যায় বিশ্ব রাজনীতি ও বিভিন্ন দেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। কারণ যেই নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদী স্বভাব-চরিত্র একজন মানুষের হৃদয়কে কঠোরতা, রূঢ়তা আর আত্মপরায়ণতায় ভরপুর রাখে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও দ্বিপাক্ষিক রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এটা তাকে কঠোরতা ও স্বার্থপরতার পথে ঠেলে দেয়। আর সে কারণেই আমরা পৃথিবীর বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সবসময়ই দেখি নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর কলা-কৌশল আর টাল-বাহানার আশ্রয় নিতে। উদ্দেশ্য থাকে, দুর্বল জাতিগুলোর গলায় গোলামির জিঞ্জির পরিয়ে দেওয়া, ছলে-বলে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ধন-সম্পদ বাগিয়ে নেওয়া। এই নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদী রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়েছে আরব ও ইসলামী বিশ্ব। কারণ, যখনই কোনো আরব কিংবা মুসলিম রাষ্ট্র নিজেদের হৃত অধিকার ফেরত চায়, তখনই তাদের সামরিক আগ্রাসনের

নগ্ন হুমকি-ধমকি দেওয়া হয়। বরং আরও আগে বেড়ে বলা যায়, যখন আমাদের কোনো রাষ্ট্র নিজের সীমানার ভেতরে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে আলোর পথে হাঁটার পরিকল্পনা করে, তখনই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বিভিন্ন খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে তার পথ আগলে দাঁড়ায়। পশ্চাৎপদ ও প্রগতিবিরোধী, অন্যায় ও বর্বর, জালেম ও অসহিষ্ণুসহ বিভিন্ন অপবাদ আর কলঙ্কের কালিমা লেপন করা হয় আমাদের পবিত্র ধর্মের সুশুভ্র অঙ্গে। ইসলামী বিশ্বের বিরুদ্ধে এই নাস্তিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদের মনে যে কতটা ঘৃণা ও বিদ্বেষ লালন করে এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ বোধহয় 'তেল'। যখন ইসলামী বিশ্ব এই তেলের ন্যায্য দাম পাওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে আবেদন করেছিল, তখন তথাকথিত এসব আন্তর্জাতিক মোড়ল আমাদের 'বিশ্ব অর্থনীতি ও সভ্যতা ধ্বংসের ষড়যন্ত্রকারী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। কারণ শুধু

একটিই, আমরা কেন আমাদের ন্যায্য অধিকার চাইতে গিয়েছিলাম? বরং এসব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বারবার হাঁক-ডাক ছেড়েছে, যদি তাদের কাছে তেল রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া হয় কিংবা তেলের মূল্য বৃদ্ধি পায়, তবে প্রয়োজনে তারা আমাদের তেলের খনি দখল করে আমাদেরই এর থেকে মাহরূম রাখবে।

এভাবেই আজ গোটা পৃথিবী সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর আন্তর্জাতিক বস্তুবাদ ও স্বার্থপরতার আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। একের পর এক তারা দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে দখল করে সেগুলোর ধন-সম্পদ লুট করছে। সেখানকার অধিবাসীদের গলায় গোলামির জিঞ্জির পরিয়েছে। আর সেগুলোকে ঠেলে দিয়েছে ভেদাভেদ, বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা আর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দিকে।

বিশ্ব রাজনীতির কর্ণধারগণ যদি আল্লাহ তাআলার একত্ববাদে বিশ্বাসী হতেন, মহান স্রষ্টার ভয় যদি তাদের হৃদয়ে সদা-সর্বদা জাগরূক থাকতো, তবে এই পৃথিবীটা আজ এতটা অশান্ত থাকত না। জাতিতে জাতিতে থাকতো ভ্রাতৃত্ববোধ আর পরস্পরের সহমর্মিতা ও ভালোবাসার সুনিবিড় বন্ধন। দুর্বলদের সহায়তা, দরিদ্রদের অনুগ্রহ আর মজলুমের মমত্ববোধ- এসবই হতো বিশ্ব রাজনীতির মূল নীতিমালা।

কিন্তু এর চেয়েও বেশি ভয় আর আতঙ্কের বিষয় হলো আধুনিক যুদ্ধের হাতিয়ার ও সমরাস্ত্র আবিষ্কার। কারণ নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য কখন যে এই নাস্তিক্যবাদী ও স্বার্থপর রাষ্ট্রগুলো গোটা পৃথিবীটা ধ্বংস করে দেয়- সেটা সম্ভবত কেউ-ই বলতে পারবে না।

ছোট ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে ধ্বংস করার জন্য আজ বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো যেসব পন্থা-পদ্ধতি এখতিয়ার করছে, তাতে কেউ বিস্মিত না হয়ে পারবে না। সমরাস্ত্রের পরিবর্তে আজ তারা ব্যবহার করছে মাদক, মিথ্যা প্রচারণা, নারী ও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের হাতিয়ার। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য হিতকর সবকিছুই তাই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চক্ষুশূল।

এভাবেই নাস্তিক্যবাদ ও মহান আল্লাহ থেকে দূরাবস্থান একটি সুন্দর মানব সমাজকে পরিণত করে জুলুম-নির্যাতন, অন্যায়-অনাচার, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-হানাহানিপূর্ণ একটি ঘৃণ্য সমাজে। ফুল ও পাখির গান নয়; সর্বদা সে সমাজে বয়ে চলে ধ্বংস আর বিনাশের তুফান। সেখানে মাদকের ভেতরে মানুষ বুঁদ হয়ে থাকে। ফুলে ওঠা আরক্তিম কামার্ত চোখে কামের নেশা দেখতে পায় পৃথিবীর সবকিছুতে। এভাবে নাস্তিক্যবাদের ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা বিশ্ব রাজনীতি একজন মানুষকে বানিয়ে ফেলে চরম স্বার্থপর ও আত্মপরায়ণ। সে কেবল এই দুনিয়ার জন্যই বেঁচে থাকে। তার সামনে উপস্থিত দিনটিকেই পূর্ণ ভোগ করতে ভালোবাসে। ফলে সে মেশিনের মতো অহর্নিশ ঘুরতে থাকে। তার জীবন ভরে ওঠে হতাশা, বিশৃঙ্খলা আর অপরাধের অভিশাপে।

নাস্তিক্যবাদ প্রতিরোধে করনীয়

যেখানে আলো আছে সেখানেই আসবে আঁধার। আলোর উপস্থিতিতেই আঁধার টুটে যায়, যাবে। সত্য-মিথ্যার দ্বন্ধ-সংঘাত অনিবার্য। এই সংঘাত চিরস্থায়ী। তাই বিশ্বাসী মানুষের সাথে আল্লাহ দ্রোহীদের চিরায়ত সংগ্রামের সমাপ্তি পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় হওয়া অবধি চলতে থাকবেই। তবে আমাদেরকে এই বিষয়ে সর্বোচ্চ তৎপর হতে হবে। পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। এখানে কয়েকটা পয়েন্ট তুলে ধরা হলো।

গনহারে ইসলামের দাওয়াত

নাস্তিকতার বিষবৃক্ষ যেনো আমাদের তরুণ-তরুণীদের ওপর ডালপালা না মেলে সেজন্যে যা করতে হবে, তা হলো গণহারে ইসলামের দাওয়াত সুন্দর-যুক্তিগ্রাহ্য পন্থায় তুলে ধরতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের এটাই বলেছেন আলকুরআনে। সুরা নহলের ১২৫ নং আয়াতে তিনি বলেছেন,

" জ্ঞান-বুদ্ধি আর উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তুমি (মানুষকে) তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান জানাও আর লোকেদের সাথে বিতর্ক কর এমন পন্থায় যা অতি উত্তম। তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে গুমরাহ হয়ে গেছে। আর কে সঠিক পথে আছে তাও তিনি বেশি জানেন।" (১৬:১২৫)

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লামও বলেছেন যে, তাঁর পক্ষ থেকে দ্বীনের একটি বাণী হলেও অপরের নিকট পৌঁছে দিতে (সহিহ বুখারি)। ইসলামের শিক্ষা সঠিকভাবে পৌঁছালে নাস্তিক- ধর্মবিদ্বেষীদের ভুল ব্যাখ্যা, অপপ্রচার রোধ করা সম্ভব হবে। আমরা আলো নিয়ে এগোলে আঁধার টুটবেই। ইন শা আল্লাহ!

দ্বীনি জ্ঞানার্জন:

জ্ঞানার্জন, ইসলামের বিধিবিধান সমূহ জানতে এবং মানতে চেষ্টা করা। মূলত জানলেই মানার স্পীড জাগে। আমাদের প্রতিটি মুসলিমের জন্য জানা ফরজ ু (স:) বলেছেন,

“দ্বীন ইলম তলব করা প্রতেক মুসলমানের ওপর ফরজ। (ইবনে মাজাহ)

। রাসুলে করিম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সীরাহ পড়লে, ইসলাম ঠিকঠাক ভাবে জানলেই নাস্তিকতার কোমর ভেঙে যাবে। আর দ্বীন শিক্ষার সুচনাটা পারিবারিক পর্যায় থেকে শুরু হওয়া উচিৎ। এখন শিশু যখন ছোট থাকে, তখন থেকেই দ্বীনের জ্ঞানের বীজ তার মধ্যে রোপন করতে হবে। তাকে ধমীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। আর এই ব্যাপারে পিতামাতার গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিগুলোতে দ্বীনি শিক্ষাকে বাধ্যতামুলক করতে হবে।

পারস্পারিক সম্পর্ক :

ইসলামপন্থীদের পারস্পরিক দূরত্ব, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঝেটিয়ে বিদেয় করে দিতে হবে। পারতপক্ষে কমিয়ে আনা। একাডেমিকলি যেসব বিষয় আলোচনার মতো সেগুলো পাবলিক প্লেসে না আনা। ছোটো খাটো বিবেদ মতবিরোধ সমূহকে উস্কে না দেয়া। সামনে না আনা। যেমন রাফউল ইয়াদাঈন, জোরে আমীন আস্তে আমীন, সুরা ফাতিহা পড়বো কী পড়বো না ইমামের পেছনে --এই ধাঁচের যা আছে সব।

উলামায়ে কেরামের ভুমিকা :

উলামায়ে কেরামকে গণমানুষের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসা। সুখে-দুঃখে পাশে থাকা। তারুণ্যের সমস্যা-সমাধান নিয়ে এবং তাদের উপযোগী কথাবার্তা বলা। তেমন কাজবাজ হাতে নেয়া। ইসলামপন্থীদেরও যুবকদের ব্যাকারত্বের সমস্যা, তরুণদের ক্যারিয়ার গাইডলাইন দেয়া। তরুণরা যেনো আলিমদের কাছে আসতে পারে, কাছে আসে সে মেজাজ অর্জন করা। সহজ করে ফুটিয়ে তোলা। কাঠিন্য পরিহার করা।

পশ্চিমাদের অসড়তা তুলে ধরা :

পশ্চিমা চিন্তা ও তাদের সভ্যতার অসারতা ফুটিয়ে তোলা। তাদের ভন্ডামিপূর্ণ চিন্তা- দর্শনে পাল্টা জবাব দিতে হবে।সেক্যুলার আইনে দেশ চালানো, শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করাটা, সে আইন অমান্য করলে শাস্তির দাবি তোলা, শাস্তি দেয়াটা সেক্যুলারন্ধ হয় না, কিন্তু যখনই কেউ ইসলামি আইন-শৃঙ্খলা, ইসলামি শিক্ষা-সমাজ ব্যবস্থার দাবি তোলে তখন বলা হয় ধর্মান্ধ। নাস্তিক-সেক্যুলারদের দাবি হলো তারা সবার চাহিদা সবার দাবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তো যখন ইসলামি আন্দোলন ইসলামি জীবন বিধান, ইসলামি যুদ্ধনীতি, জিহাদ নিয়ে দাবি তোলা হবে, মতামত তৈরি করা হবে তখন মৌলবাদী উগ্রবাদী ইত্যাদি নানারকম অদ্ভুত কিসিমে'র কথাবার্তা বলা হয় । এভাবেই হাজারো বিষয় আছে যে, সেগুলোতে এমন করে তাদের ভন্ডামি চটুলতা তাদের জীবনবোধের অসরতা তুলে ধরে সাথে সেটার ভিত্তি মূলে আঘাত হানতে হবে। তবে আগে পূর্ণরূপে কুরআন হাদিস ফিকাহ নিয়ে মোটামুটি জানাশোনা, গভীর পড়াশোনা দরকার। তাহলে নাস্তিকতা ধর্মবিরোধিতা সেক্যুলারিজম, সোশ্যালিজম হালে পানি পাবে না। নিজেকে রক্ষায় ব্যতিবস্ত হয়ে পড়লে নাস্তিকতা প্রচারের সুযোগ কোথায়?

বিজ্ঞানকে কোরআন দিয়ে পর্যালোচনা:

বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে নাস্তিকতা, ধর্মবিরোধিতা করা হয়, সে বিজ্ঞান একাডেমি আর তাদের হর্তাকর্তাদের স্বরূপ তুলে ধরা, তাদের জালিয়াতি, তাদের একপেশে চিন্তাভাবনা তাদের ভন্ডামিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরা। তারা তাদের প্রকাশিত কোনো গবেষণাপত্রে ভুল হলেও তা এড়িয়ে যায়। পুনরায় খতিয়ে দেখার প্রয়োজনবোধ করে না --দেখে না।এবং আবেগী পোলাপানদের যখন ধ্রুব সত্য হিশেবে বিজ্ঞানকে যযংউপস্থাপন করা হয়, তারা যখন দেখে কিছু থিউরি ইসলামের সাথে কন্ট্রাডিক্ট তখন তারা আবেগের বশে নাস্তিক হয়ে যায়। ইসলাম বিরোধী হয়ে ওঠে। কিন্তু দ্বীন-ধর্ম বিরোধী সেই বিবর্তনবাদীরা-ই অকপটে স্বীকার করে যে বৈজ্ঞানিক সত্য কখনো চূড়ান্ত নয়। আজ যা সাইন্টিফিক ফ্যাক্ট তা ক'দিন পরে বাতিলও হতে পারে।
এই যে এমন আরো বিষয়াদি আছে বিজ্ঞানের, সোজা কথায় সে বিষয় দিয়ে মানে সাইন্স দিয়ে সাইন্সকেই রেপ করা যায়। যেখানে ইসলাম-বিজ্ঞান হলো একে অপরের পরিপূরক সেখানে পশ্চিমা দুনিয়ার কথিত বিজ্ঞানের ধারকবাহক আর আমাদের বঙ্গীয় কথিত বিজ্ঞান মনস্করা দুটো জিনিশকে পরস্পর মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছে। তো সে জন্য বিজ্ঞানই যে ধ্রুব নয় সেটা বুঝাতেই তাদের বিভিন্ন পরস্পর বিপরীতমুখী বিষয়াদিগুলো সামনে তুলে তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সর্বস্তরে এই বিষয়গুলো জানানো উচিত। যেনো বিজ্ঞান বলেই ঈমান

আনলাম এমন না হয়। আর সে কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কিছু আলিমদেরকে বিজ্ঞান-দর্শন নিয়েও পড়াশোনা ও সেসবের ওপর জ্ঞানের গভীরতা অর্জন করা উচিত। সেটা যদি এমন হতো যে জেনারেল ছাত্ররা ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি জানার মতো পরিবেশ আর মাদ্রাসার ছাত্রদের মিনিমাম বিজ্ঞান জানাশোনার ব্যবস্থা করা যেতো তাহলে গিয়ে বিষয়টা দারুণ কাজে লাগতো। নাস্তিকতার বিষবাষ্প কম ছড়াতো তরুণদের মাঝে। আমাদের মাঝে। আমাদের সমাজে। মুসলমানদের ঘরে।

আমলের প্রতি গুরুত্বারোপ

বয়ানের ইসলামকে বাস্তবের ইসলামে (আমলে) রূপান্তর করা। নিজেই আগে আমল করা। নিজে না আমল করে বয়ান দেয়া, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার অপছন্দও তা-ই
। কথায় কাজে দা'ঈদের অমিল দেখেও অনেকেই দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়। কারণ সবার ঈমান আমান তো আর সমান না।

সামাজিক পর্যায়ে ক্যাম্পেইন :

ইসলামপন্থীদের সমাজের সর্বস্তরে একটা প্রভাব তৈরি করা। নেতৃত্ব কর্তৃত্ব করা। যেনো কোনো নাস্তিক প্রফেসর, মোটিভেশনাল স্পীকারের কিংবা সাহিত্যিকদের দিকেই হুমড়ি খেয়ে না পড়ে তরুণ-তরুণীরা। আবার যে মিডিয়ার মাধ্যমে রাতকে দিন দিনকে রাত করা হয়, এবং সেটার মাধ্যমে ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কেউ কৌশলে কেউ প্রকাশ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়ায়, বিরোধিতা করে। এরপর ধীরে ধীরে এই সবকে প্রমাণ হিশেবে কাজে লাগিয়ে পুরোদমে নাস্তিকরা তাদের(মুসলীম ঘরের তরুণদের) ঈমানী ইমারাতের ধ্বস নামিয়ে আল্লাহ দ্রোহী নাস্তিক বানিয়ে দেয়। তাই ইসলামের অনুসারীদের উচিত সত্য প্রচার-প্রকাশ করার জন্য নিজস্ব অসংখ্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সাংবাদিক-সাহিত্যিক-চিন্তক তৈরি করা। অন্ততপক্ষে তাদের মাঝে ইসলাম ও ইসলামি জীবন-বিধানের প্রতি নমনীয়, ইসলামের হিতাকাঙ্খী, ইসলামের প্রতি দরদী, ধর্মবিরোধীদের প্রতি সজাগ সচেতনতা সৃষ্টি করা। এককথায় সবদিকেই লোক তৈরি করা, দাওয়াতি কাজ করা। তাহলে নাস্তিকতা, ধর্মবিরোধিতা হালে পানি পাবে না। ইন শাআল্লাহ!

উপসংহার:

নাস্তিক্যবাদ বর্তামানে এক ভয়ানক সমস্যায় পরিনত হয়েছে। তরুন সমাজ এর করাল গ্রাসে পড়ছে বেশি পরিমানে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ,সংস্কৃতি, অর্থনীতি ইত্যাদির প্রভাবে তারা নাস্তিক্যবাদের দিকে ঝুকে পড়ছে।এটা শুধু ব্যক্তিজীবনের ওপর প্রভাব ফেলছে তাই নয়, এটা তার পরিবার,সমাজ এবং রাষ্ট্রের ওপরেরও প্রভাব ফেলছে। তাদেরকে এই করাল গ্রাস থেকে বের করে আনার জন্য আমাদেরকে তৎপর হতে হবে। এর জন্য মুসলামদের উচিৎ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেমন: গনহারে ইসলামের দাওয়াত, দ্বীনি জ্ঞানার্জনের প্রতি তাগিদ, পশ্চিমাদের অসাড়তা তুলে ধরা, নিজেদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি না করে ইসলামের সুন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলা, বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যা গুলো কোরআন দিয়ে ব্যাখ্যা করা, সামাজিক পর্যায়ে ক্যাম্পেইন, আমলের প্রতি গুরুত্বরোপ ইত্যাদি। তাছাড়া আমাদের ওয়ামায়ে কেরামগনকে অনেক বেশি সোচ্চার হতে হবে। দ্বীনের বিষয়ে তাদেরকে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করতে হবে, যাতে খুব সহজেই নাস্তিকদের প্রশ্নের উচিৎ

জবার দিয়ে তাদের ধারনাকে সমূলে উৎপাটন করতে পারে। সর্বোপরি, আল্লাহ আমাদেরকে সবাইকে তার একনিষ্ঠ বান্দা হিসেবে কবুল করুন এবং নাস্তিক্যবাদে করাল গ্রাস থেকে হেফাজত করুন,আমিন।

রেফারেন্স :

উইকিপিডিয়া, বাংলা হাদিস, ওয়ার্ডপ্রেস, আল কোরআন ।